HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৭ • সংখ্যা ৪ • ডিসেম্বর ২০০৯
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৯

নারী এবং বালিকাদের কাছে পৌঁছানো: বাংলাদেশে পরিচালিত একটি জাতীয় এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা

পৃষ্ঠা ১৬

এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর ওপর বিশেষ নজর: শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহজনিত রোগের চিকিৎসায় আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে নতুন ওয়ার্ড

পৃষ্ঠা ২৫

সার্ভিলেন্স আপডেট

২০০৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দুটি জেলায় কিউটেনাস অ্যানথ্রাক্সের প্রাদুর্ভাব

বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি অনুসন্ধানীদল ২৪ আগস্ট থেকে ২৯ অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দুটি জেলার তিনটি গ্রামে গরু ও ছাগলের হঠাৎ অসুস্থতা ও মৃত্যু এবং মানুষের ত্বকে ঘা-সংক্রান্ত তিনটি প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত করে। পশুর অসুস্থতার লক্ষণসমূহ ছিলো পূর্ব থেকে জ্বরে আক্রান্ত থাকা বা না থাকা অবস্থায় হঠাৎ খিঁচুনী হওয়া অথবা মাটিতে পড়ে যাওয়া এবং পরে মারা যাওয়া। মানুষের অসুস্থতার লক্ষণ ছিলো ত্বকে ঘা দেখা দেওয়া। পশু এবং মানুষ উভয়ের মধ্যেই রোগের লক্ষণসমূহ ছিলো অ্যানথ্রাক্সের মতো। অনুসন্ধানী দল ৪০টি পশু সনাক্ত করে যেগুলোর মধ্যে ৩৫টি মারা যায় এবং ৫টিকে জবাই করা হয়। দলের সদস্যরা ৫৫ জন রোগী সনাক্ত করেন যাদের দুজন ছাড়া বাকি সবাই হয় অসুস্থ পশু জবাই করার কাজে নিয়োজিত ছিলো বা যে স্থানে জবাই করা হয় সে স্থানে উপস্থিত ছিলো, অথবা জবাই করা অসুস্থ গরু কিংবা ছাগলের কাঁচা মাংস ধরেছিলো বলে জানা যায়। গবাদি পশুগুলোকে নিয়মিত টিকা দেওয়া হয় নি এবং মৃত পশুগুলো নদীতে অথবা বন্যার পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। দুটি জবাই হওয়া গরু, একটি অসুস্থ গরু, একটি অসুস্থ ছাগল এবং একটি মৃত ছাগল থেকে রক্ত, অস্থিমজ্জার স্মেয়ার এবং সোয়াব সংগ্রহ করা হয় (নিউট্রিয়েন্ট ব্রোথে করে)। রোগীদের কাছ থেকে রক্ত ও ভেসিকুলার সোয়াব সংগ্রহ করা হয়।

icddr,b

KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

স্মেয়ার নমুনাসমূহ পরীক্ষার জন্য স্টেইন করা হয় এবং সোয়াব নমুনাসমূহ কালচার করা হয়। স্টেইনিং-এর সাহায্যে পশু এবং মানুষের নমুনাগুলো থেকে রোগজীবাণু (ব্যাসিলাই) চিহ্নিত করা হয় এবং মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত সোয়াবের নমুনা ও একটি মৃত ছাগলের চোখ থেকে নেওয়া রসের নমুনা কালচারের মাধ্যমে *বি. অ্যানথ্রাসিস* জীবাণু সনাক্ত করা হয়। গবাদি-পশুকে নিয়মিত অ্যানথ্রাক্স টিকা দিয়ে, অসুস্থ পশু জবাই করা থেকে বিরত থেকে এবং মৃত পশু সঠিকভাবে অপসারণের মাধ্যমে অর্থাৎ সংক্রমণ এড়িয়ে চলা-সংক্রান্ত উন্নত জ্ঞান আহরণ করে অ্যানথ্রাক্স রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার কমিয়ে আনা সম্ভব।

অ্যানথ্রাক্স পশু-থেকে-মানুষ এবং মানুষ-থেকে-পশুতে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম (জুনোটিক) এমন একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা স্পোর-ফরমিং *ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস* জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে (১-৫)। সাধারণত বন্য এবং গৃহপালিত উভয় ধরনের পশুর অ্যানথ্রাক্স হতে পারে (১,৪,৬)। আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে অথবা আক্রান্ত পশুর চামড়া, হাড় বা মাংস ধরার মাধ্যমে কিংবা সংক্রামিত পশু থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি থেকে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশের ফলে মানুষ সংক্রামিত হতে পারে (১,৩)। অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ তিনভাবে ঘটতে পারে, যেমন, কিউটেনাসের মাধ্যমে (যাতে চামড়ায় ক্ষত হয়); নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে (যা ফুসফুসকে আক্রান্ত করে); এবং পাকাস্ত্রিকভাবে (যা পরিপাক নালীকে আক্রান্ত করে) (১-৫)।

২৪ আগস্ট ২০০৯, আইসিডিডিআর,বির একজন পশু-চিকিৎসক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত পাবনা জেলার একটি গ্রাম থেকে খবর পান যে, ১৭ আগস্ট থেকে সেখানকার গবাদি-পশু অতিরিক্ত জ্বর এবং খিঁচুনীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ১৮ আগস্ট দুটি অসুস্থ গরু জবাই করা হয় এবং এরপর থেকে অনেকের ত্বকে ঘা (লেসন) দেখা দেয়। যেহেতু অসুস্থ গরু জবাই করার পর ত্বকে ঘা দেখা দেয় সেহেতু সন্দেহ করা হয় যে, অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণের ফলে এ-প্রাদুর্ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), বাংলাদেশ সরকারের পশুসম্পদ বিভাগ (ডিএলএস) এবং আইসিডিডিআর,বির সমন্বয়ে গঠিত একটি অনুসন্ধানী দল ঘটনা তদন্ত করার জন্য ২৬ আগস্ট পাবনা যায়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ দলটি সিরাজগঞ্জের একটি গ্রামে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত গরু জবাই করার পর মানুষের অসুস্থতা-সংক্রান্ত আরেকটি প্রাদুর্ভাবের খবর পায়, যা প্রথম প্রাদুর্ভাব এলাকা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দলের সদস্যরা ০১ অক্টোবর ২০০৯ প্রাদুর্ভাব এলাকাটি পরিদর্শন করেন। ২৯ অক্টোবর গ্রামটিতে পুনরায় পরিদর্শনে গিয়ে তাঁরা পার্শ্ববর্তী গ্রামে তৃতীয় আরেকটি প্রাদুর্ভাব আবিষ্কার করেন।

ডিএলএস এবং আইসিডিডিআর,বির পশু-চিকিৎসকগণ রোগতাত্ত্বিক ও রোগের লক্ষণজনিত (ক্লিনিক্যাল) তথ্য সংগ্রহ করেন এবং উক্ত এলাকায় অসুস্থতার সম্ভাব্য কারণ ও রোগ সংক্রমণের সম্ভাব্য পথ খুজে বের করার চেষ্টা করেন। সবগুলো প্রাদুর্ভাবের ধরন ছিলো একই রকম, যেমন, গরু ও ছাগলের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, যার ফলে সেগুলো জবাই করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে মানুষের ত্বকে ঘা দেখা দেয়। ১৭ আগস্ট ২০০৯ থেকে জ্বরসহ অথবা জ্বর ছাড়া হঠাৎ মৃত্যু অথবা খিঁচুনীকে পশুর অসুস্থতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এলাকার পশুস্বাস্থ্য ও অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকাদান-সংক্রান্ত নীতি এবং টিকার ব্যবহার-সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য দলটি স্থানীয় পশু-চিকিৎসকদের সাথে

নিউট্রিয়েন্ট ব্রোথ=জীবাণু বেঁচে থাকার উপযোগী পুষ্টিসম্বলিত পাত্র
স্মেয়ার=অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার উপযোগী করার জন্য গ্লাস-স্লাইডে প্রলেপ দেওয়া
স্পোর=রোগজীবাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ রেণুবিশিষ্ট একধরনের জীবাণু যা অক্সিজেন ছাড়া এবং প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচতে সক্ষম

আলোচনা করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবের সময় দলটি একটি অসুস্থ গরু এবং একটি অসুস্থ ছাগলের গলা, নাক, পায়ুপথ এবং মুত্র ও জননেন্দ্রিয় থেকে সোয়াব এবং রক্তের নমুনা এবং একটি মৃত ছাগলের রক্ত ও চেখের রসের নমুনা সংগ্রহ করে। অসুস্থতার সময় জবাইকৃত দুটি গরুর হীমায়িত মাংস থেকে অস্থিমজ্জা সংগ্রহ করা হয়। প্রথম প্রাদুর্ভাবের সময় আক্রান্ত পশু থেকে সংগৃহীত নমুনাসমূহ পরীক্ষার জন্য সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি), আটলান্টায় পাঠানো হয় এবং সংগৃহীত অস্থিমজ্জার নমুনাসমূহ ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরিতেও (সিডিআইএল) পরীক্ষা করা হয়।

দলটি সন্দেহভাজন মানুষের রোগতাত্ত্বিক, ক্লিনিক্যাল এবং রোগের সংস্পর্শে আসার ইতিহাসও পরীক্ষা করে। তাঁরা অসুস্থতার অতীত ইতিহাস জানার জন্য স্থানীয় চিকিৎসকদের সাথেও কথা বলেন। রোগের প্রারম্ভিক লক্ষণ এবং পরীক্ষার ফলাফলসহ প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, অ্যানথ্রাক্সের ফলেই প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়েছিলো। ১৮ আগস্ট ২০০৯ থেকে যারা হঠাৎ করে ত্বকে শুকনা গোটা (প্যাপুল) এবং/অথবা পানিসহ গোটা (ভেসিক্যাল), মাঝখানে কালো দাগসহ গোল হয়ে ফোলা-সংক্রান্ত অসুস্থতায় ভুগছে তাকে অ্যানথ্রাক্স রোগী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রাদুর্ভাবের বিস্তার ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য রোগতাত্ত্বিক দলটি এলাকার আক্রান্ত প্রতিটি বাড়ি পরিদর্শন করে এবং নির্ধারিত প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে। ত্বকের ঘা-সংক্রান্ত তথ্য রোগীর নিজের কাছ থেকে এবং শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবে সনাক্তকৃত রোগীদের কাছ থেকে তাঁরা স্লাইড স্মেয়ারের জন্য রক্ত এবং ভেসিকুলার রস এবং কালচারের জন্য নিউট্রিয়েন্ট ব্রোথে করে ভেসিকুলার সোয়াব সংগ্রহ করেন। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং জীবাণুসমূহের ধরন জানার জন্য প্রথম প্রাদুর্ভাবের নমুনাসমূহ তাঁরা সিডিসিতে প্রেরণ করেন। আইইডিসিআর-এর মাইক্রোবায়োলোজি ল্যাবরেটরিতে রক্তের তিনটি নমুনা কালচার এবং চারটি স্মেয়ার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। অনুসন্ধানী দলটি প্রথম প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত তিনজন রোগীর ত্বকের নমুনা সংগ্রহ করে তা ইম্মিউনোহিস্টোক্যামেস্ট্রি (আইএইচসি) পরীক্ষার জন্য সিডিসিতে প্রেরণ করেন।

আইসিডিডিআর,বির নৃতাত্ত্বিক দল প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করে এবং সে এলাকার লোকজন কর্তৃক অসুস্থ পশু জবাই করা, তা খাওয়া এবং মৃত পশু অপসারণের ব্যাপারে তাদের ধারণা ও আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।

তিনিটি প্রাদুর্ভাব এলাকায় মোট ৪০টি অসুস্থ পশু চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে ৩৪টি (৮৫%) গরু এবং ৬টি (১৫%) ছাগল। চব্বিশটি (৬৯%) ছিলো স্ত্রী প্রজাতির। গরুর মিডিয়ান বয়স ছিলো ২৪ মাস (রেঞ্জ: ০.৫-৯৬ মাস) এবং ছাগলের মিডিয়ান বয়স ছিলো ৪ মাস (রেঞ্জ: ৩-১২ মাস)। চল্লিশটি পশুর কোনোটিই বাঁচে নি, এদের মধ্যে ৩৫টি (৮৮%) মারা যায় এবং ৫টি (১২%) জবাই করা হয়। রোগের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ ছিলো অতিরিক্ত জ্বর, পড়ে যাওয়া, নিস্পৃহতা এবং খিঁচুনি (সারণি ১)। পশু-চিকিৎসকগণ একটি ছাগল মারা যাওয়ার পর তার নাক থেকে রক্ত ঝরতেও দেখেছেন।

প্রথম প্রাদুর্ভাব এলাকায় ৩৫ জন রোগীর ত্বকে ঘা দেখা যায়। তেত্রিশজন সংক্রামিত হয় দুটি গরু জবাই করার সময় সেগুলোর সংস্পর্শে এসে অথবা কাঁচা মাংস ধরে কিংবা যেখানে জবাই করা হয়

তার নিকটেই অবস্থান করার ফলে। অন্য দুজন রোগীর একজন দাদী অথবা নানী যিনি অসুস্থ গরু জবাই করার পাঁচদিন পর দূরবর্তী একটি গ্রাম থেকে বেড়াতে আসেন এবং সাতদিন ধরে ত্বকে ঘায়ে আক্রান্ত নাতীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার ১১ দিন পর তাঁর ত্বকে ঘা দেখা দেয়। অপরজন একজন পুরুষ, যার কাছ থেকে জানা যায় যে, তার ত্বকে ঘা দেখা দেয় শুধুমাত্র একটি খালের পানিতে হাত ধোয়ার ফলে, যে খালে মৃত গরু ভাসতে দেখা যায় (চিত্র ১)।

দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবের সময় ১৫ জন রোগী সনাক্ত করা হয়। তাদের ত্বকে

সারণি ১: অসুস্থ পশুর জনমিতিক ও ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য (সংখ্যা=৪০)

রোগতাত্ত্বিক	সংখ্যা	হার
গরু	৩৪	৮৫.০
ছাগল	৬	১৫.০
বয়স (মাস):		
গরু: মিডিয়ান (রেঞ্জ)	২৪ (০.৫-৯৬)	-
ছাগল: মিডিয়ান (রেঞ্জ)	৪ (৩-১২)	-
ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্যসমূহ:		
জ্বর	২৪	৬০.০
পড়ে যাওয়া	১৮	৪৫.০
ক্ষুধামান্দ	১৬	৪০.০
নিস্পৃহতা	১১	২৭.৫
খিঁচুনি	৯	২২.৫
অবসন্নতা	১০	২৫.০
ডায়রিয়া	৪	১০.০
শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট	৪	১০.০
দুধ কমে যাওয়া	১	২.৫
মাংসপেশীর কম্পন	২	৫.০
অসুস্থতার ফলাফল:		
মৃত্যু:	৩৫	৮৮.০
অসুস্থতা শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধে	২৩	৫৮.০
১-৭ দিনের মধ্যে	১২	৩০.০
জবাই করা হয়েছে	৫	১২.০

*চিত্র ১: রোগের প্রাদুর্ভাব এবং জবাইকৃত পশুর সাথে মানুষের অসুস্থতার সম্পর্ক**

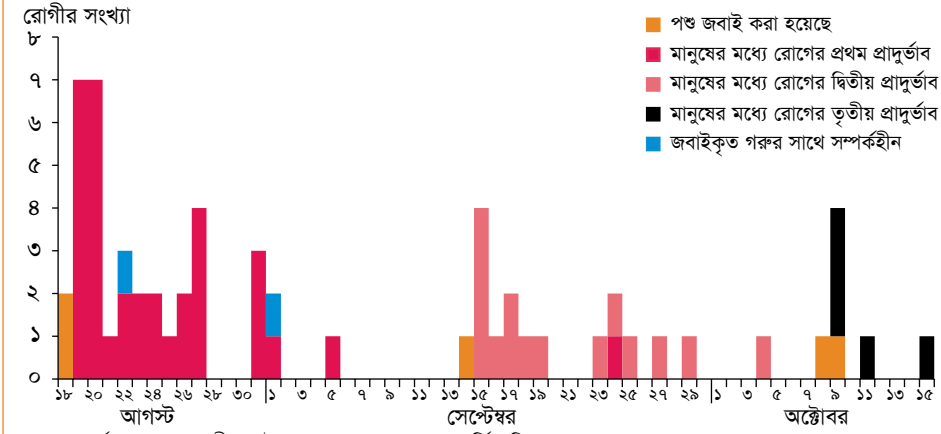

*প্রথম প্রাদুর্ভাবের দুজন রোগী জবাইকৃত অসুস্থ গরুর সাথে সম্পর্কিত ছিলো না

ঘা দেখা দেয় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে তারা একটি অসুস্থ গরু জবাই করা কিংবা তার মাংস ধরার পর। তৃতীয় প্রাদুর্ভাবের সময় পাঁচজন রোগী সনাক্ত করা হয়। তাদের ত্বকে ঘা দেখা দেয় ৮ এবং ৯ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে দুটি ছাগল জবাই করে কিংবা জবাইকৃত ছাগলের মাংস ধরার পর (চিত্র ১)।

তিনটি প্রাদুর্ভাবে ত্বকে ঘা দেখা দেওয়া ৫৫ জন রোগী সনাক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ৩১ জন (৫৬%) ছিলো পুরুষ। রোগীদের মিডিয়ান বয়স ছিলো ২৫ বছর (রেঞ্জ: ১-৭০ বছর) এবং গড় বয়স ছিলো ২৮ বছর। অসুস্থ গরু জবাই করা বা মাংস ধরার গড়ে ৫দিন পর সবাই অসুস্থ হয় (সারণি ২)। সব রোগীর ত্বকে ঘা ছিলো, আর তার সাথে ছিলো চুলকানি, জ্বর, দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, মাথাব্যাথা এবং তলপেটে ব্যাথা (সারণি ২)। ত্বকে যেসব ঘা পরিলক্ষিত হয় তাহলো– শুকনা গোটা (প্যাপুল) এবং/অথবা পানিসহ গোটা (ভেসিক্যাল), ঘা, লাল হয়ে ফুলে ওঠা (ইরেথেমা), মাঝখানে কালো দাগসহ গোল হয়ে ফোলা ও স্পর্শে ব্যাথা অনুভব করা (সারণি ২ এবং চিত্র ২)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব বাহুর ত্বকে ঘা দেখা যায় (৭৫%) তবে নিম্ন বাহু, মুখমণ্ডল, বুক, পিঠ, গলা এবং মাথায়ও তা পরিলক্ষিত হয় (সারণি ৩)।

যাদের ত্বকে ঘা ছিলো তাদের অধিকাংশ রোগী (৯৬%) অসুস্থ গরু জবাই করার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো অথবা জবাই হওয়া অসুস্থ গরুর কাঁচা মাংস ধরেছিলো কিংবা জবাই করার স্থানে উপস্থিত ছিলো। সাতাশি শতাংশ রোগী অসুস্থ পশুর মাংস খেয়েছিলো, ৮০% অসুস্থ পশুর কাঁচা মাংস ধরেছিলো, ৩৩% অসুস্থ গরু অথবা ছাগল জবাই করেছিলো, ৩৩% রোগী অসুস্থ

সারণি ২: আক্রান্ত মানুষের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য এবং অসুস্থতার লক্ষণসমূহ

জনমিতিক বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা (হার)
বয়স শ্রেণী (বছরে)	
১-১০	১১ (২০.০)
১১-২০	১৩ (২৪.০)
২১-৩০	১০ (১৮.০)
৩১-৪০	৮ (১৫.০)
>৪০	১৩ (২৪.০)
লিঙ্গ	
পুরুষ	৩১ (৫৬.০)
মহিলা	২৪ (৪৪.০)
ক্লিনিক্যাল লক্ষণ:	
ত্বকে ক্ষত	৫৫ (১০০.০)
চুলকানি	৩৯ (৭১.০)
জ্বর	৩৬ (৬৫.০)
অবসন্নতা/দুর্বলতা	২৪ (৪৪.০)
মাথাব্যাথা	২০ (৩৭.০)
বমি বমি ভাব	১৫ (২৮.০)
পেটব্যাথা	৬ (১১.০)
কাশি	৫ (৯.০)
ডায়রিয়া	১ (২.০)
মিডিয়ান বয়স (বছরে) (রেঞ্জ)	২৫ (১-৭০)

চিত্র ২: ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় সনাক্তকৃত কিউটেনাস অ্যানথ্রাক্স

পশুর সংস্পর্শে এসেছিলো এবং ১৩% রোগী মৃত পশুর সংস্পর্শে এসেছিলো (সারণি ৪)। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকগণ সিপ্রোফ্লোক্সাসিনের সাহায্যে সকল রোগীর চিকিৎসা করেন।

প্রথম প্রাদুর্ভাবে জবাই করা অসুস্থ গরুর অস্থিমজ্জার স্মেয়ার পলিক্রম মেথালিন ব্লু দ্বারা সিডিআইএল-এ স্টেইন করা হয় এবং সেগুলো থেকে গ্রাম পজিটিভ ক্যাপসুলেটেড জীবাণু সনাক্ত করা হয়। আইইডিসিআরের মাইক্রোবায়োলোজি ল্যাবরেটরিতে গ্রাম স্টেইনিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে তিনজন রোগীর নমুনা থেকে দণ্ডাকৃতির জীবাণুও সনাক্ত করা হয় এবং সেগুলো *ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস* হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। দুজন রোগীর সোয়াব এবং একটি মৃত ছাগলের চোখের তরল পদার্থ থেকে সিডিসি *ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস* সনাক্ত করে। সিডিসিতে মাল্টিপল-লুকাস ভেরিয়েবল-নাম্বার টেনডেম রিপিট এনালাইসিস (এমএলভিএ) পদ্ধতিতে পশু ও মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত নমুনা থেকে জীবাণু সনাক্ত করা হয় এবং উভয় প্রজাতিই একই ধরনের জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিলো বলে নিশ্চিত করা হয়। আইএইচসি পদ্ধতিতে তিনটি টিসু বায়োপসি এবং এম'ফাদাইয়ান পদ্ধতিতে চারটি ভেসিকুলার সোয়াব স্মিয়ার স্টেইনিং করে সেগুলো থেকেও *বি. অ্যানথ্রাসিস* সনাক্ত করা হয়। *ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস* টক্সিন প্রোটিনের বিরুদ্ধে রোগীরা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে কি না তা দেখার জন্য সিডিসিতে এনজাইম-লিংকড ইম্মিউনো-এবসরবেন্ট অ্যাসে (এলাইজা) করা হয়। ছাব্বিশজন রোগীর মধ্যে ১৫ জনের (অসুস্থ অবস্থায় এবং আরোগ্যলাভের পর যাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে) ক্ষেত্রে এন্টি-পিএ

সারণি ৩: মানুষের ত্বকে ঘায়ের বৈশিষ্ট্য ও শরীরে এর বিস্তার (সংখ্যা=৫৫)

ত্বকের ঘায়ের বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা (হার)
শুষ্ক গোটা (প্যাপুল)	৪৩ (৮০.০)
পানিসহ গোটা (ভেসিকেল)	৩৭ (৬৭.০)
ঘা	৩৯ (৭১.০)
চারিপাশে লাল হওয়া (ইরেথেমা)	৩৬ (৬৮.০)
ঘায়ের মাঝখানে কালো দাগ	৩৪ (৬২.০)
ঘায়ের চারপাশ ফুলে যাওয়া	৩১ (৫৯.০)
ত্বকের ঘায়ের বিস্তার	
ঊর্ধ্ব বাহু	৪১ (৭৫.০)
নিম্ন বাহু	১০ (১৮.০)
মুখমণ্ডল	৫ (৯.০)
বুক	৫ (৯.০)
পিঠ	২ (৪.০)
গলা	১ (২.০)
পেট	১ (২.০)
মাথা	১ (২.০)

সারণি ৪: ১৮ আগস্ট ২০০৯ তারিখ থেকে রোগের সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণসমূহ (সংখ্যা=৫৫)

ঝুঁকির ধরন	সংখ্যা (হার)
অসুস্থ প্রাণীর মাংস খেয়েছিলো	৪৮ (৮৭.০)
অসুস্থ প্রাণীর মাংস ধরেছিলো	৪৪ (৮০.০)
অসুস্থ প্রাণী জবাই করেছিলো	১৮ (৩৩.০)
অসুস্থ প্রাণীর সংস্পর্শে এসেছিলো	১৭ (৩১.০)
মৃত প্রাণীর সংস্পর্শে এসেছিলো	৭ (১৩.০)
সুস্থ প্রাণীর সংস্পর্শে এসেছিলো	২৬ (৪৮.০)
ঝুঁকির সংস্পর্শে আসা থেকে রোগ শুরু হওয়ার সময়কাল	
মিডিয়ান (রেঞ্জ) (দিনে)	৪ (১-৮)

টাইটারের (সেরো-কনভার্টেড) চারগুণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিবেদক: প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি; রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পশুসম্পদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ্যানুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, ইউএসএ

মন্তব্য

এই অনুসন্ধানে রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রোগ-সম্পর্কিত তথ্য এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, প্রাদুর্ভাবসমূহ অ্যানথ্রাক্স জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো, যা একটি জুনোটিক রোগ এবং মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। আক্রান্ত পশুদের রোগের লক্ষণসমূহ, যেমন, হঠাৎ করে জ্বর বা জ্বর ছাড়া এবং খিঁচুনীসহ অসুস্থতা শুরু হওয়া (মারা যাওয়ার মতো অবস্থা) ছিলো অ্যানথ্রাক্সের ইঙ্গিতবাহী। আক্রান্ত মানুষের মধ্যে কিউটেনাস অ্যানথ্রাক্সের বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত লক্ষণ ও উপসর্গ বিদ্যমান ছিলো (১,৩)। তাছাড়া, কিছু রোগীর ত্বকের ঘা থেকে সংগৃহীত সোয়াব এবং অ্যান্টি-পিএ এলিসা পরীক্ষায় প্রাপ্ত বেশিরভাগ রোগীর সেরোকনভারশন থেকে নিশ্চিত বোঝা যায় যে, প্রাদুর্ভাবটি ছিলো অ্যানথ্রাক্স রোগের। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রাদুর্ভাবের নমুনাসমূহ যদিও পরীক্ষা করা হয় নি তথাপি সেগুলোর রোগতাত্ত্বিক সংযোগ এবং লক্ষণসমূহ ছিলো প্রথম প্রাদুর্ভাবের মতো একই ধরনের, যা অ্যানথ্রাক্স বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রাদুর্ভাব এলাকায় আক্রান্ত পশুদের থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির (বাই-প্রডাক্ট) সংস্পর্শে আসা লোকদের মধ্যে কিউটেনাস অ্যানথ্রাক্স স্পস্টত প্রতীয়মান হয়। যদিও সংস্পর্শের মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষে অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ সচরাচর দেখা যায় না (১), কিন্তু অনুসন্ধানী দলটি এমন একজন রোগীর সন্ধান পায়, যে আক্রান্ত পশুর কাঁচা মাংস ধরে নি তবে, পশু জবাই করার নিকটস্থ স্থানে একজন রোগীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সাতদিন মেলামেশা করার পর সম্ভবত সে আক্রান্ত হয়।

অনুসন্ধানী দলটি যদিও আগস্ট ২০০৯ থেকে এ-পর্যন্ত তিনটি প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত করেছে, কিন্তু এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জানা যায় যে, বহু বছর ধরেই তাদের এলাকায় *তরকা* (অ্যানথ্রাক্সের স্থানীয় নাম) রোগে গবাদি-পশু মারা যাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে আরো জানা যায় যে, অসুস্থ গরু জবাই করার পর থেকে এলাকার লোকজনের মধ্যে একই ধরনের ত্বকের ঘা দেখা গেছে। যদিও গত ২৫ বছরে এই এলাকা থেকে অ্যানথ্রাক্স রোগের কথা জানা যায় নি, তারপরও এটি সম্ভবত এই এলাকায় সব সময় বিরাজমান থাকা একটি রোগ (এনডেমিক) (৭)। এই এলাকায় সবসময় অ্যানথ্রাক্স রোগ দেখা দেওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমন, এই এলাকায় গবাদি-পশুর ঘনত্ব অনেক বেশি। এখানকার অধিকাংশ এলাকাবাসী গবাদি-পশু লালন-পালন এবং দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য এমনকি তাদের বাড়ির উঠানও ব্যবহার করে থাকে। গরু অথবা ছাগল মারা যাওয়ার পর তারা তাদের গোয়াল জীবাণুমুক্ত করে না। এই এলাকাটি নিম্নাঞ্চল এবং বর্ষাকালে এটি বন্যাকবলিত হয় আর তাই সে-সময় যদি কোনো গবাদি পশু মারা যায় তাহলে কৃষকেরা সাধারণত তা পানিতে ভাসিয়ে দেয়। অ্যানথ্রাক্স যেহেতু একটি স্পোর বহনকারী জীবাণু এবং বহু বছর ধরে মাটির মধ্যে জীবন্ত থাকতে পারে (৬), সেহেতু উল্লিখিত কার্যকলাপসমূহ রোগটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা রাখে বলে মনে হয়। কারণ, স্রোতে ভেসে গিয়ে আক্রান্ত পশুর মৃতদেহগুলো শেষ অবধি কোনো একটি স্থানে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মাটিতে আটকে থাকে।

অসুস্থ গরু অথবা ছাগলের মাংস খাওয়া এলাকার মানুষের একটি সাধারণ অভ্যাস বলে নৃতাত্ত্বিক দলটির কাছে মনে হয়েছে। অসুস্থ পশু জবাই করা, মাংস ধরা আথবা খাওয়ার ফলে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে তারা অবগত ছিলো না। গবাদি-পশু হারানোর অর্থনৈতিক ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পশুর মালিকরা অসুস্থ পশু জবাই করার জন্য এলাকার লোকজনের সহযোগিতা লাভ করে। এই মাংসের দাম কম এবং যেহেতু অধিকাংশ লোকজন উচ্চমূল্যের ফলে নিয়মিত মাংস খেতে পারে না, তাই তারা সাধারণত এ-মাংস ক্রয়ে আগ্রহী হয়। পশুর মৃতদেহ খোলা যায়গায় ফেলে দেওয়া অথবা বন্যার পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার ফলে পরিবেশগত যে ঝুঁকির সৃষ্টি হয় সেসম্পর্কেও এলাকার জনসাধারণ অবগত নয়। অসুস্থ গবাদি-পশু জবাই করা থেকে বিরত থাকা, সংক্রামিত মাংস না ধরা অথবা তা না খাওয়ার বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পশুর মৃতদেহ গভীর গর্তে পুতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলার (১) ব্যাপারে এলাকার জনগণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ-রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে রোগের যে লক্ষণ দেখা যায় তা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব।

যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণের জীবিকা এবং প্রোটিনের অন্যতম প্রধান উৎস গবাদি-পশু, তাই প্রতি বছর নিয়মিত টিকা দিয়ে এদের রক্ষা করাই অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে, বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুর জন্য মোট ৯০ মিলিয়ন ডোজ অ্যানথ্রাক্স টিকার প্রয়োজন, কিন্তু বছরে উৎপাদিত হয় মোট ১.৫ মিলিয়ন ডোজ। টিকার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একটি কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ-অঞ্চলে অ্যানথ্রাক্স রোগের হার কমিয়ে আনা এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব। অ্যানথ্রাক্স রোগের ঝুঁকি পরিমাপ করার লক্ষ্যে এবং পশু ও মানুষের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগটি পর্যবেক্ষণ করা এবং শুরুতেই তা সনাক্ত ও চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ একটি সার্ভিলেন্স পদ্ধতি চালু করা উচিত।

References

1. Centers for Disease Control and Prevention. Questions and Answers About Anthrax. (http://www.bt.cdc.gov/agents/anthrax/faq/, accessed on 30-11-09).
2. Dixon TC, Meselson M, Guillemin J, Hanna PC. Anthrax. *N Engl J Med* 1999;341:815-26.
3. Sun Francisco Department of Public Health. Anthrax, July 2008. California, CA: Sun Francisco Department of Public Health, 2008. 14 (http:www.sfcdcp.org/document.html?id=311, accessed on 02-12-09).
4. Thappa DM, Karthikeyan K. Anthrax: an overview within the Indian subcontinent. *Int J Dermatol* 2001;40:216-22.
5. Centers for Disease Control and Prevention. Anthrax: Comprehensive CDC information about bioterrorism and related issues. (http://www.anthrax.osd.mil, accessed on 02-12-09).
6. World Organization for Animal Health. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2009. (http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/A_summry.htm, accessed on 03-12-09).
7. Samad MA, Hoque ME. Anthrax in man and cattle in Bangladesh. *J Trop Med Hyg* 1986;89:43-5.

নারী এবং বালিকাদের কাছে পৌঁছানো: বাংলাদেশে পরিচালিত একটি জাতীয় এইচআইভি প্রতিরোধ কর্মসূচির অভিজ্ঞতা

২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকার যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি জাতীয় এইচআইভি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত দুটি জাতীয় সমীক্ষা এবং তিনটি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণের পর অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে যে বিষয়টি জানা গেছে তা হলো, যুবতী মেয়েদের এইচআইভি-সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির উৎস ভিন্ন ধরনের এবং তারা এ-সংক্রান্ত তথ্য পেতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধার সম্মুখীন হয়। মোট কথা যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি-সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান কম এবং যুবতীদের মধ্যে তা আরো কম। এই পার্থক্যগুলো আমলে নিয়ে জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত কর্মসূচিগুলোর যোগাযোগ কলা-কৌশল এমনভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন যাতে নিশ্চিতভাবে সব যুবসমাজের কাছে এইচআইভিসম্পর্কিত তথ্য পৌঁছায়।

২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ'-শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিলো ১৫-২৪ বছর-বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এইচআইভি-সংক্রমণ প্রতিরোধ করে প্রকারান্তরে বাংলাদেশে যাতে এইচআইভি মহামারী আকারে দেখা না দেয় সে ব্যাপারে সাহায্য করা। প্রকল্পের নির্দিষ্ট কাজ ছিলো সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিওর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারাভিযান, যুব-সংগঠনসমূহের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী শিক্ষা প্রদান, মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিকের পাঠ্য বইয়ে এইচআইভি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম সন্নিবেশিত করা এবং স্বাস্থ্যসুবিধাকে যুবসম্প্রদায়ের কাছে আরো যুববান্ধব করে তোলা। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিলো এইচআইভি প্রতিরোধসম্পর্কিত তথ্য পেতে লিংগভেদে বৈষম্য চিহ্নিত করা এবং এ-সংক্রান্ত সচেতনতা এবং সমতা বৃদ্ধি করা।

যেসব সূত্র থেকে এই নিবন্ধে ব্যবহৃত উপাত্তসমূহ নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো -- গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস, টিউবারকিউলোসিস অ্যান্ড ম্যালেরিয়া (জিএফএটিএম)-এর আওতায় ২০০৫ এবং ২০০৮ সালে যুবসম্প্রদায়ের ওপর পরিচালিত দুটি জাতীয় সমীক্ষা এবং অন্যান্য তিনটি গবেষণার ফলাফল যেগুলোর একটি প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে (১); এবং অন্য চারটি প্রতিবেদন যা জাতীয় এইডস ও এসটিডি কর্মসূচি (এনএএসপি), সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ এবং আইসিডিডিআর,বি কর্তৃক অচিরেই ছাপা হতে যাচ্ছে। অপ্রকাশিত এসব প্রতিবেদনের মধ্যে রয়েছে 'বাংলাদেশে যুব সম্প্রদায়, সমাজের মুরুব্বী, সমাজপতি এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং ধারণা মূল্যায়ন' (২), 'এইচআইভি/এইডস-সংক্রান্ত বিনোদনমূলক শিক্ষা কর্মসূচির ফলাফল' (৩), 'বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস-এর ওপর নির্মিত স্বল্পদৈঘ্য চলচিত্রের তড়িৎ সমীক্ষা' (৪) এবং 'বাংলাদেশে দুটি নির্ধারিত জেলায় এইচআইভি/এইডস-এর ওপর শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকার তড়িৎ সমীক্ষা' (৫)।

তথ্যসূত্রসমূহে লিংগ বৈষম্য

২০০৮ সালের জাতীয় সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ছাপানো উপকরণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বাদ দিলে কোনো একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে এইচআইভি-সংক্রান্ত শিক্ষা পুরুষরা যতটুকু পেয়েছে তার সাথে একই উৎস থেকে মেয়েদের প্রাপ্ত শিক্ষার পার্থক্য অনেক। চিত্র ১-এ দেখা যায় যে, অবিবাহিত

ছেলেরা এইচআইভি-সংক্রান্ত খবরাখবর গণমাধ্যম (রেডিও এবং টেলিভিশন) এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি শুনেছে, এবং অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পরিবার থেকে এইচআইভি-সংক্রান্ত তথ্য শোনার হার অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে বেশি। বিবাহিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেও একই ধারা লক্ষণীয়, যদিও তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা ছিলো আরো বেশি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এইচআইভি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের হার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে ছিলো প্রায় দ্বিগুণ। যেখানে ৫৭% অবিবাহিত মেয়ে এইচআইভিসম্পর্কিত ক্লাশে উপস্থিত ছিলো, সেখানে অবিবাহিত ছেলেদের উপস্থিতি ছিলো মাত্র ৪৬%। বিবাহিত পুরুষ এবং মেয়েদের মধ্যে অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এইচআইভি-সংক্রান্ত তথ্য জানার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায় নি, যদিও এইচআইভি-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করা হয় এমন কোনো ক্লাশে বিবাহিত পুরুষদের মাত্র চারভাগের একভাগের মত অংশ উপস্থিত ছিলো।

চিত্র ১: ২০০৮ সালে বাংলাদেশে সাধারণ সূত্র থেকে এইচআইভি সম্পর্কে জানা অবিবাহিত যুবক/যুবতীদের হার

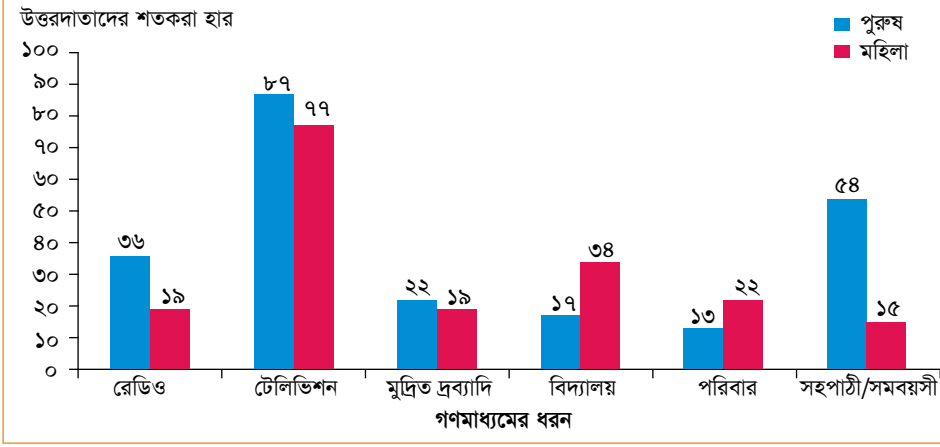

তথ্য পেতে লিংগ বৈষম্য

গণমাধ্যম থেকে তথ্য পেতে বাংলাদেশে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সীমাবদ্ধতা বেশি (২,৬,৭)। প্রতি সপ্তাহে মেয়েদের তুলনায় তিনগুণ বেশি ছেলে টেলিভিশন, রেডিও এবং খবরের কাগজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। আলাদাভাবে প্রতিটি প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রেও একই চিত্রের প্রতিফলন দেখা যায় (চিত্র ২)। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে অবশ্য এই পার্থক্যটি সবচেয়ে কম যেখানে সপ্তাহে ছেলেদের তুলনায় মাত্র ২৪% কম মেয়ে টেলিভিশন দেখে বলে জানায়। এই লিংগ বৈষম্য গ্রামে এবং বিবাহিতদের মধ্যে আরো বেশি, বিশেষ করে গ্রামের বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি, যেমন, ২৩% গ্রামের মেয়ে এবং ২২% বিবাহিত মেয়েদের প্রচার মাধ্যমের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই, যেখানে গ্রামের ছেলেদের ক্ষেত্রে এ-হার ৪% এবং বিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫%।

প্রযুক্তিজ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে এই যে বৈষম্য তা নির্দিষ্ট এইচআইভি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের প্রতিফলন নয়। যেমন, যুবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে টেলিভিশন দেখার সুযোগ যদিও কম তবে বাংলাদেশে টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারিত *হিরা/ফুল* নামে

এইচআইভি প্রতিরোধ-সংক্রান্ত একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান দেখার হার যুবকদের (১৬%) তুলনায় তাদের মধ্যে বেশি (২৬%) (পি<০.০১)। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে টেলিভিশনের ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠান দেখার প্রবণতার সাথে সম্ভবত এই বৈষম্যের একটি মিল আছে। *হিরাফুল* ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের উপযোগিতা মূল্যায়নের জন্য পরিচালিত সমীক্ষার উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, শেষবার যখন ছেলে এবং মেয়েরা বিটিভির অনুষ্ঠান দেখেছে তখন ছেলেদের মধ্যে অন্য চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখার হারও বেশি মনে হয়েছে। একইরকমভাবে, শেষবার দেখা অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন ছেলে এবং মেয়েদের কোনো নাটকের অনুষ্ঠান দেখার হার সমান, তখন মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি খেলাধুলা এবং খবর শুনেছে বলে জানা যায়।

চিত্র ২: ২০০৮ সালে সাপ্তাহিকভিত্তিতে গণমাধ্যমের সংস্পর্শে আসা যুবক/যুবতীদের শতকরা হার

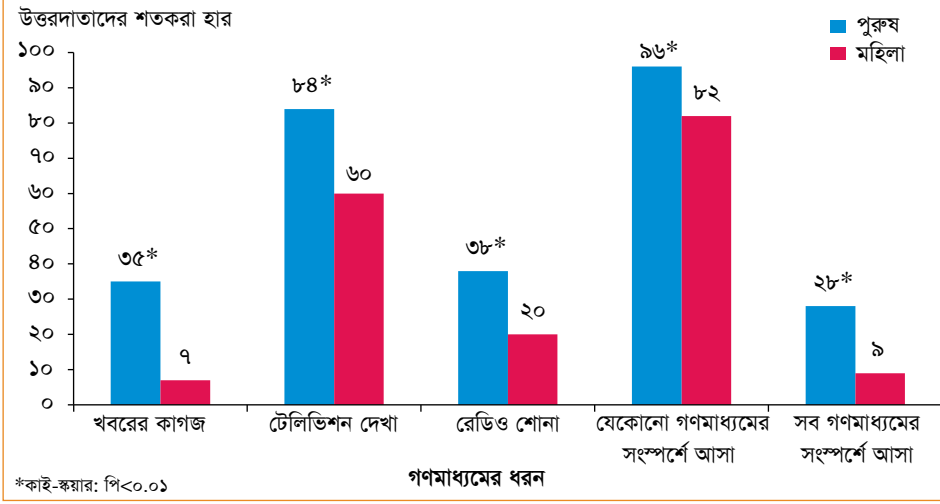

*কাই-স্কয়ার: পি<০.০১

তথ্য পেতে লিংগ-প্রতিবন্ধকতা

মেয়েরা নানারকম সামাজিক প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হয় যা তাদের জন্য এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য পেতে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। চলমান ভ্যানে করে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র প্রদর্শণের বিষয়টি সম্পর্কে যারা জানতো কিন্তু চলচিত্রটি দেখেনি তাদের মধ্যে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে সেটি না দেখার ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা মূল্যায়ন করা হয় (৪)। চলচিত্রটি দেখার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে থাকা প্রতিবন্ধকতায় পার্থক্য ছিলো (চিত্র ৩)। মেয়েদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাধারণ প্রতিবন্ধকতাটি ছিলো পরিবার থেকে দেখতে বাধা দেওয়া (২৩%) এবং এর পরে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাগুলো ছিলো চলচিত্রটি সুবিধামতো জায়গায় প্রদর্শিত না হওয়া (২৮%) এবং অসময়ে প্রদর্শন (২৭%)। অন্যদিকে, ৭৩% ছেলে সেটি দেখতে যায় নি কারণ দেখানোর সময়টি তাদের জন্য উপযুক্ত ছিলো না। সেটি যখন দেখানো হয় তখন তারা কাজে ব্যস্ত ছিলো। সহধর্মী বা পরিবার থেকে বাধা দেওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষত্রে প্রযোজ্য এবং অবিবাহিত যুবসম্প্রদায় বা বিবাহিত প্রাপ্ত-বয়স্কদের তুলনায় বিবাহিত মেয়েরা এ-ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে বেশি। চলচিত্রটি দেখতে যেসব বাধা ছিলো তার বেশিরভাগই সেটি প্রদর্শণের সময়, এলাকা এবং সেখানে পুরুষ মানুষের উপস্থিতিসম্পর্কিত (এটি দেখানো হয় সন্ধ্যার সময় বিদ্যালয় বা গ্রামের

কোনো খোলা মাঠে)। একজন বিবাহিত মেয়ে যে চলচিত্রটি দেখে নি তার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি চলচিত্রটি দেখতে না পারা অন্যান্য মেয়েদের সমস্যার একটি সাধারণ প্রতিফলন বলে মনে হয়:

'... সন্ধ্যাবেলা বিদ্যালয়ের মাঠে চলচিত্রটি দেখানো হয় যেখানে অনেক পুরুষ মানুষ উপস্থিত ছিলো, এবং সেই কারণে আমার পরিবার সেখানে গিয়ে অন্য পুরুষের সাথে বসে আমাকে চলচিত্রটি দেখতে দেয় নি ...'

চিত্র ৩: ২০০৮ সালে প্রকাশ্যে দেখানো চলচিত্র যারা দেখতে পারেনি, কিন্তু আগ্রহী ছিলো, তাদের দেখতে না পারার কারণ

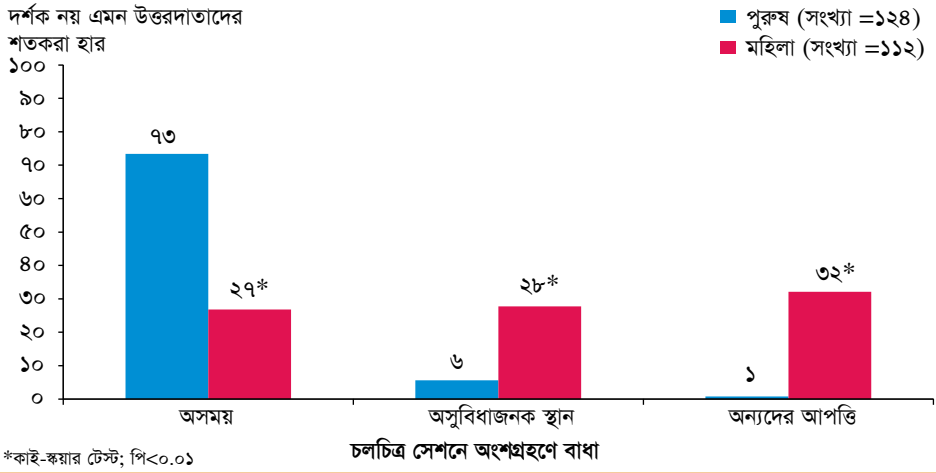

*কাই-স্কয়ার টেস্ট; পি<০.০১

অন্য যেসব সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা তথ্য পেতে বাধার সৃষ্টি করে সেগুলোও *হীরাফুল* ধারাবাহিক মূল্যায়ণের সময় সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার অংশ হিসেবে যুবসম্প্রদায়ের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে কি না। ছেলেদের তুলনায় বেশি মেয়েরা যেখানে বিজ্ঞাপনচিত্র দেখার কথা বলেছে, সেখানে সামাজিক কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা কীভাবে মেয়েদেরকে তথ্য পেতে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে তারা সেগুলোর উদাহরণ দিয়েছে। তারা কখন বিজ্ঞাপনচিত্র পড়া বন্ধ করেছে তা একজন মেয়ের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়:

'... আমি যখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিজ্ঞাপনচিত্র পড়ছিলাম তখন কিছু যুবক ছেলে খারাপ মন্তব্য করে এবং আমাকে উত্যক্ত (টিজ) করে ...'

লিংগ-সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রথাও তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮৬% শিক্ষকের কাছ থেকে জানা যায় যে, এইচআইভি-সংক্রান্ত পাঠদানের সময় ছেলেরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে থাকে। *হীরাফুল* ধারাবাহিক নিয়ে আলাপ-আলোচনার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ছেলে এবং মেয়েরা ভিন্ন ভিন্নভাবে এ-ধারাবাহিক থেকে পাওয়া তথ্যের মূল্যায়ন করেছে। ছেলেরা সাধারণত তাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে তথ্যগুলো আলোচনা করে, অথচ মেয়েরা শুধুমাত্র বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করে।

এইচআইভি-সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে লিংগ বৈষম্যের সমূহ প্রভাব

স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব মেয়েদের ওপর কম বলে প্রতীয়মান হয়। এইচআইভি-সংক্রান্ত সমন্বিত জ্ঞানের অধিকারী (যারা এইচআইভি-সংক্রমণ প্রতিরোধের সঠিক পন্থা এবং প্রধান প্রধান ভুল ধারণা সম্পর্কে জানে) যুবক-যুবতীদের সংখ্যা সাধারণত কম এবং যুবতীদের মধ্যে এ-সংখ্যা অপেক্ষকৃতভাবে আরো কম। এ-সংজ্ঞা অনুসারে মাত্র ৯% মেয়ে সমন্বিত জ্ঞানের অধিকারী, যেখানে ছেলেদের হার ১৫% (চিত্র ৪)। একইধরনের পার্থক্য দেখা যায় সব শ্রেণীর মধ্যে, অর্থাৎ অবিবাহিত মেয়েদের তুলনায় অবিবাহিত ছেলেরা (১৭% এবং ১০%, পি≤০.০০১) এবং বিবাহিত নারীদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষরা এব্যাপারে বেশি জ্ঞানী (১০% এবং ৮%, পি≤০.০৫)। অধিকন্তু, শহর (১৯% এবং ১০%) এবং গ্রাম (১৪% এবং ৮%) উভয় অঞ্চলেই এইচআইভি-সংক্রান্ত সমন্বিত জ্ঞান নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

চিত্র ৪: ২০০৮ সালে যারা যৌনবাহিত এইচআইভি-সংক্রমণ প্রতিরোধের সঠিক পন্থা চিহ্নিত করেছে এবং যারা এইচআইভি সংক্রমণ-সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের শতকরা হার

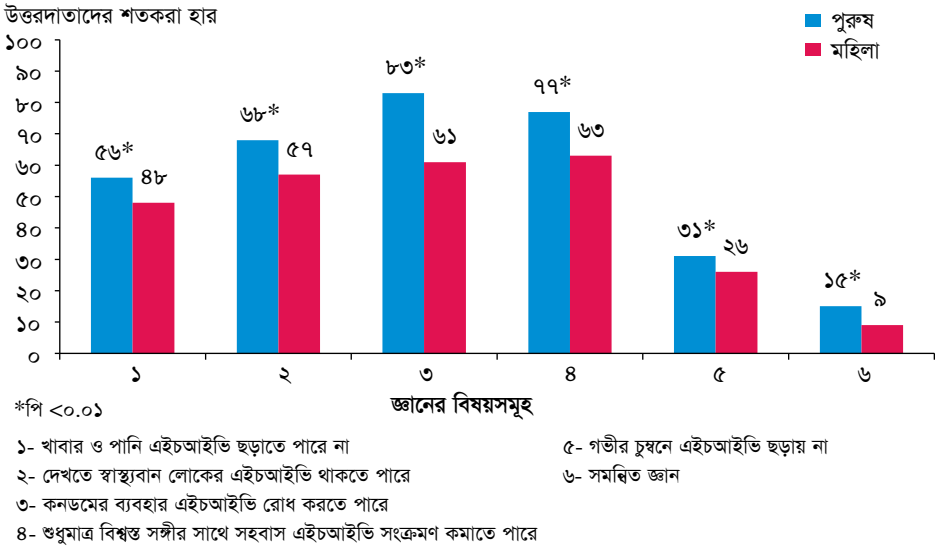

এইচআইভি সম্পর্কে ভুল ধারণা যুবকদের তুলনায় যুবতীদেরর মধ্যে বেশি দেখা গেছে (চিত্র ৫)। এই ভুল ধারণাসমূহ অবশ্য ২০০৫ সাল থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, তবে এক্ষেত্রেও যুবতীরা পিছিয়ে, অর্থাৎ এসব ভুল ধারণা যুবতীদের থেকে যুবকদের মধ্যে বেশি কমেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ২০০৫ সালে যেখানে ছেলে এবং মেয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে গড়ে ৬৪% মনে করতো যে, কাশি এবং হাঁচির মাধ্যমে এইচআইভি রোগ ছড়াতে পারে, সেখানে ২০০৮ সালে এই সংখ্যা ছেলেদের মধ্যে কমে ৪৮% এবং মেয়েদের মধ্যে ৫৬% হয়েছে। একইভাবে প্রথম প্রতিবেদনে খাদ্য এবং পানীয় ভাগাভাগি করে খাওয়ার মাধ্যমে এইচআইভি রোগ ছড়ায় বলে ৬০% ছেলে এবং মেয়ের ভুল ধারণা ছিলো, অথচ পরবর্তী প্রতিবেদনে এই সংখ্যা ছেলেদের মধ্যে কমে ৪৪% এবং মেয়েদের মধ্যে ৫২%-এ দাঁড়ায়।

চিত্র ৫: ২০০৮ সালে যুবক/যুবতী এবং কিশোর/কিশোরীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ-সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা

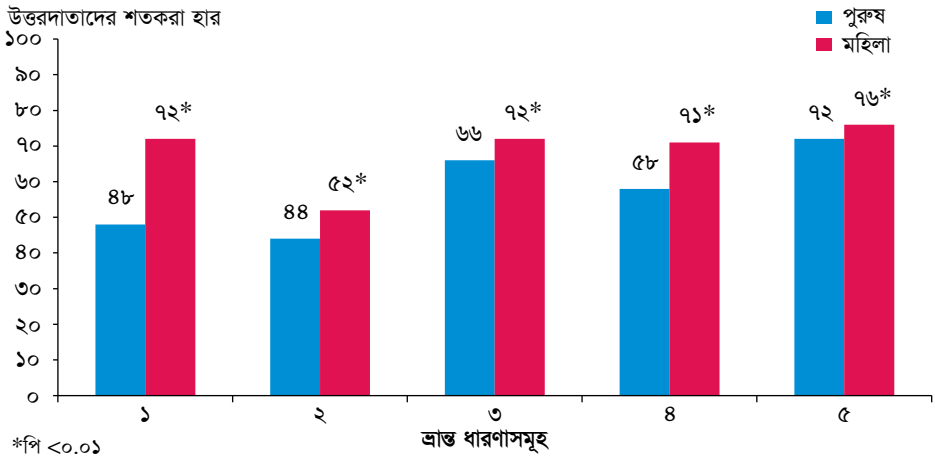

*পি <০.০১

১- কাশি এবং হাঁচির মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়
২- একই পুকুরে গোসল করলে এইচআইভি ছড়ায়
৩- যৌনমিলনের পর যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলা এইচআইভি প্রতিরোধ করে
৪- টিকার মাধ্যমে এইচআইভি প্রতিরোধ করা যায়
৫- মাসিক চলাকালীন যৌনমিলন এইচআইভি প্রতিরোধ করে

প্রতিবেদক: ন্যাশনাল এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ডিপার্টমেন্ট অব মাস কমিউনিকেশনস, তথ্য মন্ত্রণালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; মাত্রা; পায়াক্ট; সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ; হেলথ সিসটেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। তাদের অর্থের যোগানদাতা গ্লোবাল ফান্ড ফর এইডস, টিউবারকিউলোসিস অ্যান্ড ম্যালেরিয়া। ব্যাবস্থাপনায় - সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ

মন্তব্য

বহুমুখী এই গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, এইচআইভি-সংক্রান্ত তথ্য আহরণে লিংগের প্রভাব বিদ্যমান। এইচআইভি-সংক্রমণ সম্পর্কে যুবতীদের জ্ঞান কম এবং তাদের পক্ষে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা আরো বেশি কঠিন। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহে পার্থক্য থাকলেও তা ছেলেদের জন্য তেমন বিশেষ সুবিধা বয়ে নাও আনতে পারে, কারণ বেশিসংখ্যক ছেলেরা সমবয়সীদের কাছ থেকে এইচআইভি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে বলে জানায়, যেখানে মেয়েরা বেশিরভাগ তাদের বিদ্যালয় থেকে এসব তথ্য জানার কথা বলেছে। এইচআইভি-সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়ানোর ক্ষেত্রে সমবয়সীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ বিদ্যালয়ের তুলনায় সমানভাবে কার্যকর নাও হতে পারে, কারণ শিক্ষকদের তুলনায় সমবয়সীদের কাছে অপর্যাপ্ত এবং ভুল তথ্য থাকতে পারে। তবে বিদ্যালয়েও লিংগসম্পর্কিত রীতিনীতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। যৌন-সংক্রান্ত তথ্যের স্পর্শকাতরতা এবং যৌন-সংক্রমণ-সংক্রান্ত তথ্য থাকার ফলে শিক্ষক ছাত্রদেরকে বিশেষ করে মেয়েদেরকে তা সঠিকভাবে বোঝাতে সক্ষম নাও হতে পারেন। এই বিষয়টি শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীর অনেক স্থানে যৌন এবং প্রজনন বিষয়ে সামাজিক রীতিনীতি একধরনের স্থবিরতার জন্ম দেয় যা ওই-সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে

বাধার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য (৮)।

বিগত বছরগুলোতে এইচআইভি-সংক্রান্ত জ্ঞান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ-সংক্রান্ত ভুল ধারণাও কিছুটা কমেছে এবং ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তথাপি এইচআইভি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে যাতে তাদের কাছে পৌঁছানো যায় সেজন্য আরো ভালো কলা-কৌশল নির্ণয় করে প্রতিরোধ কর্মসূচিসমূহে তা সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন মেয়েদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে সম্পর্কে আরো নিবিড় তথ্য সংগ্রহ করা। বেশির ভাগ বিবাহিত নারীদের যেহেতু তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ কম এবং অবিবাহিত মেয়েদের তুলনায় তাদের এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেহেতু তাদের কাছে পৌঁছানোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিবাহিত জনগোষ্ঠির যৌনকর্ম যৌন-সংক্রমণের একটি বিশেষ মাধ্যম বলে মনে করা হয়।

যুবসম্প্রদায় যাতে তথ্য সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেখান থেকে পরিবেশিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে সেই মোতাবেক লক্ষ্য স্থির করে কাজ করা দরকার। যেমন, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সভা-সমিতিতে পরিবেশন করলেও মেয়েদের চলাফেরার ওপর সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা এসব সামাজিক সভা-সমিতিতে খুব একটা যোগ দিতে পারে না। তথ্যের উৎসসমূহে মেয়েদের প্রবেশ বাড়াতে শুধুমাত্র তাদের জন্য বেশি গ্রহণযোগ্য স্থানে (যেমন, বিদ্যালয়), অথবা ডিভিডি প্লেয়ারের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে বা অপেক্ষাকৃত ছোট স্থানে কিংবা দিনের বেলায় অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থাসহ বিকল্প কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। একইভাবে ছেলেদের জন্যও তাদের সুবিধামতো সময়ে এবং মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করার বিষয়ে অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত যাতে তারাও ঠিকমতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই বাস্তব সমাধানে পৌঁছতে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সময়ে যারা তথ্য পরিবেশন করে তাদেরকে উজ্জিবীত করে লিংগ-সংক্রান্ত রীতিনীতি যা তথ্যসূত্রসমূহে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, তাও ঠিক করা দরকার। যেমন, যেসব শিক্ষক এইচআইভি-সংক্রান্ত পাঠদান করেন তাঁদেরকে লিংগ বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করে ছাত্রদেরকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তা অনুশীলন করার প্রচুর সুযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষকরা যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করেন তখন তাঁদের সাথে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সমন্বিত এবং সঠিক তথ্য পরিবেশন নিশ্চিত করা যেতে পারে। স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে পাঠদানে তাঁদেরকে শক্তি ও সাহস যোগানোর জন্য বিদ্যালয়-নেতৃত্ব এবং মাতাপিতাসহ এলাকার সমর্থনও তাঁদের প্রয়োজন। পরিশেষে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য লিংগ-সমতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কর্মসূচি প্রণয়ন করার সময় এ-বিষয়ে বাধা-প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সজাগ থাকা প্রয়োজন এবং এমন কলা-কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা সমস্ত জনগোষ্ঠির প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

References

1. Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare. Baseline HIV/AIDS Survey among Youth in Bangladesh-2005. Dhaka: National AIDS/STD Programme, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, 2005.
2. Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare. Assessment of HIV/AIDS related knowledge and attitudes among youth, gatekeepers, community leaders and policy makers in Bangladesh. Dhaka: National AIDS/STD Programme, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, 2009.
3. Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare. Impact of an HIV/AIDS Prevention Entertainment-Education Programme: Endline Survey Report. Dhaka:

National AIDS/STD Programme, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, 2009.

4. Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare. Rapid Assessment of a Short Film on HIV/AIDS in Bangladesh. Dhaka: National AIDS/STD Programme, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, 2009.
5. Bangladesh. Ministry of Health and Family Welfare. Rapid assessment of the role of teachers' training in HIV/AIDS prevention in two selected district in Bangladesh. Dhaka: National AIDS/STD Programme, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, 2009.
6. Bangladesh Centre for Communication Programs. National Media Survey: 2002. Dhaka: BCCP, SMC. 2003.
7. National Institute of Population Research and Training (NIPORT). Bangladesh Demographic and Health Survey Report 2007. Dhaka: NIPORT, Mitra and Associates, & Macro International. 2007.
8. The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Report on the Global HIV/AIDS Epidemic 2008. Switzerland: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2008. 362p. [UNAIDS/08.25E/JC1510E] (www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp, accessed on: 07 February 2009).

এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর ওপর বিশেষ নজর: শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহজনিত রোগের চিকিৎসায় আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে নতুন ওয়ার্ড

২০০৯ সালের মার্চ মাসে এবং এপ্রিলের প্রথমদিকে মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসের উদ্ভব হয়। ভাইরাসটি খুব দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয় ২০০৯ সালের জুন মাসে আইসিডিডিআর,বিতে। বাংলাদেশে এ-ধরনের রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় মহামারীটিকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এবং কর্মচারীদেরকে এ-সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত রোগী সনাক্ত এবং চিকিৎসার জন্য একটি আলাদা ওয়ার্ড গঠন করে। ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ এই ওয়ার্ডের কার্যক্রম শুরু হয়। শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত রোগের চিকিৎসায় চালু ওয়ার্ডে (রেসপিরেটরি ট্রায়াজ) শেষ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৭৫৫ জন রোগী জ্বর এবং কাশি নিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে ৮৭ জনকে (১১%) ভর্তি করা হয় এবং বাকীদেরকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ১০ জন এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত বলে আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় নিশ্চিত করা হয় এবং তাদেরকে জীবাণুনাশক ওষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) ছাড়াও অসেলটামিভির দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তাদের সবাই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং হাসপাতাল থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

২০০৯ সালের মার্চ মাসে এবং এপ্রিলের প্রথমদিকে মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসের উদ্ভব হয় (১)। দুমাসের মধ্যে ভাইরাসটি দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে (১)। এই মূহুর্তে পরিক্রমণরত এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসের রিঅ্যাসর্টমেন্ট তিনগুণ হয়েছে এবং এতে এভিয়ান, সোয়াইন এবং মানুষের মধ্যে সংক্রমণকারী ভাইরাসের জিন সন্নিবেশিত হয়েছে (২)। এটি সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে এবং তার হাঁচি বা কাশি থেকে অথবা পরোক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় (১,৩,৪)। ইনকিউবেশনের সময়কাল সাধারণত ১-৭ দিন, তবে এর বেশিও হতে পারে। রোগের সাধারণ লক্ষণসমূহ হচ্ছে, এটিকে ভাইরাসজনিত অন্য যেকোনো শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ থেকে আলাদা করা যায় না, এবং এতে সাধারণত জ্বর, কাশি, গলাব্যাথা, খাবারে অরুচি, অবসন্নতা, মাথাব্যাথা এবং শরীরব্যাথা লক্ষ্য করা যায় (১,৩)। শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি রোগীর জ্বর এবং কাশিসহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণত উল্লিখিত লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হয় (১,৫)। বাংলাদেশে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসের প্রথম ধাক্কার সময় শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগ নির্ণয়ের জন্য কোথাও কোনো ট্রায়াজ গড়ে তোলার খবর পাওয়া যায় নি। তাই আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালের রেসপিরেটরি ট্রায়াজে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত এই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং এখানে আগত কম অসুস্থ (অ্যাম্বুলেটরি) রোগীরা পূর্ব থেকে কী ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিলো এবং তার জন্য তারা এখান থেকে কী চিকিৎসাসেবা পেয়েছে তা মূল্যায়ন করে একটি বিবরণী তৈরি করা হয়।

আইসিডিডিআর,বি খুব দ্রুত এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী মোকাবেলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শ্বাসতন্ত্রজনিত তীব্র সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিডিডিআর,বি তার ঢাকা হাসপাতালের মুখে একটি আলাদা ওয়ার্ড গঠন করে। হাসপাতালে ভর্তি অন্যান্য রোগী এবং আইসিডিডিআর,বির কর্মীদের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে এই ওয়ার্ডের মধ্যে আবার আলাদা একটি ট্রায়াজ গঠন করা হয় এবং সেখানে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত লক্ষণ নিয়ে আগত রোগীদের পরীক্ষা করে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ঢাকা হাসপাতালে আগত রোগীদের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত রোগের লক্ষণ যেমন, জ্বর অথবা কাশি, শরীরব্যাথা, মাথাব্যাথা, ঠাণ্ডায় কাঁপা, অবসন্নতা, নাক দিয়ে পানি ঝরা, ঘন নিঃশ্বাস এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট ইত্যাদি ছিলো কি না তা খুব দ্রুত পরীক্ষা করা হয়। এই ধরনের লক্ষণজনিত রোগী পাওয়া গেলে তাদেরকে শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য গঠিত ট্রায়াজে (রেসপিরেটরি ট্রায়াজ) সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তাদের রোগসম্পর্কিত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড করা হয় এবং নম্বর (স্কোর) দেওয়া হয় (চিত্র ১)। এই লক্ষণগুলো দেখা না গেলে রোগীদেরকে ডায়রিয়া ট্রায়াজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রেসপিরেটরি ট্রায়াজে রোগীদেরকে পরীক্ষা করে রোগের তীব্রতার ওপর (প্রত্যেক রোগীকে তার জন্য নির্দিষ্ট একটি স্কোর কার্ডে দেওয়া স্কোর অনুযায়ী রোগের তীব্রতা নির্ণয় করা হয়) তাদের চিকিৎসায় প্রাধান্য দেওয়া হয়। রোগের তীব্রতা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত এই পদ্ধতি মেক্সিকোর সিভিল ডি গুয়াদালজারা হাসপাতালে মহামারীর শুরুর দিকে চালু করা হয় (৫,৬)। চিকিৎসকগণ কর্তৃক কম ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদেরকে (স্কোর ≤৬) পরীক্ষা করার পর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং পুনরায় আসার পরামর্শ দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাঝারি (স্কোর ≤৭-১৫) এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ (স্কোর ≥১৬) রোগীদেরকে নির্ধারিত স্থানে পর্যবেক্ষণে রাখা হয় যেখানে এইচ১এন১ পরীক্ষার (আরটি-পিসিআর) জন্য তাদের প্রত্যেকের নাক ধোয়া পানি নেওয়া হয় (৭)।

চিত্র ১: এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর প্রথম ধাক্কায় আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের ট্রায়াজে ব্যবহৃত স্কোরিং কার্ড

কারণসমূহ	স্কোর
জ্বর	২
কাশি	২
জ্বর ও কাশি	৬
মাথাব্যাথা	১
শরীরব্যাথা	১
ঠাণ্ডায় কাঁপা	১
অবসন্নতা	২
ডায়রিয়া	১
শ্বাসকষ্ট	২
প্রডাকটিভ কাশি	-৪
রাইনোরিয়া	-৪
লিমফোপেনিয়া	৪
থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া	৪
লিউকোসাইটোসিস	-৪
বুকের অস্বাভাবিক এক্স-রে	৪
সাত বারের বেশি গত বছর বহির্বিভাগে এসেছিলো	২
পূর্বে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো	২
অন্যান্য রোগসমূহ (ফুসফুসের রোগ, হৃদরোগ, বৃক্ক-সংক্রান্ত অসুস্থতা, সলিড অর্গান প্রতিস্থাপন, এইচআইভি, অন্যান্য ইম্মিউনোসাপ্রেস্যান্ট, স্নায়ুতান্ত্রিক রোগ, রক্ত কিংবা রক্ত-সংক্রান্ত নয় এমন ক্যান্সার)	২
উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ	≥১৬
মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ	৭-১৫
কম ঝুঁকিপূর্ণ	≤৬

এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত নিশ্চিত এবং সন্দেহভাজন রোগীদের সবাইকে একস্থানে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসম্বলিত আলাদা একটি ওয়ার্ড সাময়িকভাবে গঠন করা হয়। আলো-বাতাস প্রবেশের যথেষ্ট সুবিধাসসহ তাঁবু দিয়ে এই ওয়ার্ডটি গঠন করা হয় যেখানে ছয়ফুটেরও বেশি দুরত্ব রেখে কিছু বিছানা পাতানো হয়। তিনটি ভিন্ন অংশে এটিকে বিভক্ত করা হয় -- একটি ট্রায়াজের রোগী সংগ্রহের জন্য, একটি সন্দেহভাজন রোগী পর্যবেক্ষণের জন্য এবং অন্যটি এইচ১এন১ মহহামারী ২০০৯-এ আক্রান্ত নিশ্চিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত। এই ওয়ার্ডের সব রোগীদেরকে দ্রুত এবং কার্যকর চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটি ব্যবস্থপনা পদ্ধতি (চিত্র ২,৩) তৈরি করা হয় (৮,৯)। পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসক, নার্স এবং প্যারামেডিক কর্মীরা আটঘণ্টা পরপর পালাক্রমে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিলো সহজে বহনযোগ্য এক্সরে মেশিন, অ্যাম্বু ব্যাগ, বড়ধরনের অক্সিজেন সিলিন্ডার, পালস অক্সিমিটার এবং নেবুলাইজার। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত নিশ্চিত রোগীদেরকে অসেলটামিভির (ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর একটি ওষুধ) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, এবং কমিউনিটি থেকে আক্রান্ত নিউমোনিয়া রোগীদেরকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী সনাক্ত করে বেটা ল্যাকটাম, এজিথ্রোমাইসিন অথবা ফ্লুরোকুইনোলোন

অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু করতে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়াসহ রোগীদের চিকিৎসার জন্য মানসম্মত পদ্ধতি তৈরি করা হয় এবং সেগুলো কঠোরভাবে পালন করা হয়। কক্ষে প্রবেশকারী সব কর্মচারী উপযুক্ত মাস্ক, গাওন, চশমা, গ্লোভস ও টুপি পরে এবং জুতা ঢেকে তারপর কক্ষে প্রবেশ করে। ওয়ার্ডে দর্শনার্থীদের প্রবেশের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। ওয়ার্ডে কর্মরত কর্মচারীদেরকে তাঁদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে এবং জ্বরজাতীয় কোনো অসুস্থতা দেখা দিলে তা জানাতে বলা হয়। মানসম্মত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে ওয়ার্ডের ময়লা অপসারণ করা হয়।

চিত্র ২: এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর প্রারম্ভে আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালের ট্রায়াজে অনুসৃত রোগী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

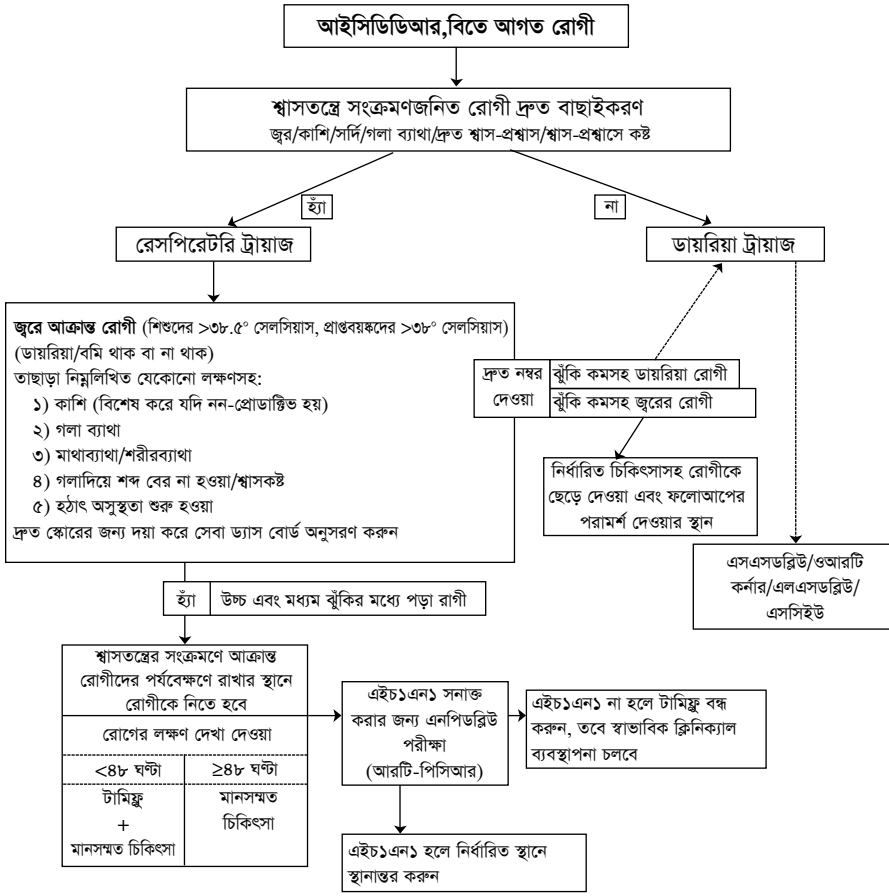

এসএসডব্লিউ=শর্ট স্টে ওয়ার্ড, এলএসডব্লিউ=লং স্টে ওয়ার্ড, এসসিইউ=স্পেশাল কোয়ার ইউনিট, সেবা ড্যাস বোর্ড= ডিজিটাল সিস্টেম, টামিফ্লু=ওসেলটামিভির, এনপিডব্লিউ=নসোফেরিনজেল ওয়াস, ওআরটি=ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি

চিত্র ৩: এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর প্রথম ধাক্কায় আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে শ্বাসতন্ত্রে তীব্র সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের পর্যবেক্ষণ এলাকায় অনুসৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

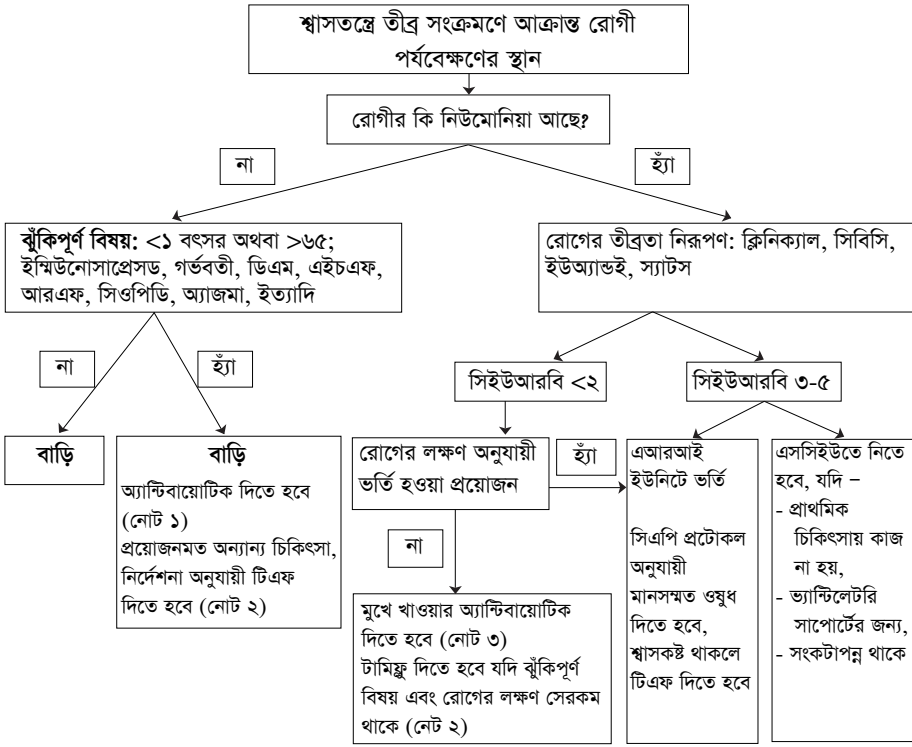

নোট:

১) খাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক (নিউমোনিয়া না থাকা অবস্থায়):

ক. প্রাপ্তবয়স্ক: অ্যামোক্সিসিলিন ৫০০ এমজি দৈনিক তিনবার করে ৫দিন

খ. শিশু: অ্যামোক্সিসিলিন ১২৫-২৫০ এমজি দৈনিক তিনবার করে মোট ৫দিন

২) টিএফ (অসেলটামিভির) ব্যবহার করা যেতে পারে যদি ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণ ও খুব জ্বর থাকে, এবং ৪৮ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে লক্ষণ দেখা যায়। চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ক্লিনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর। (যেমন, ওষুধের সহজপ্রাপ্যতা)।

৩) খাওয়ার অ্যান্টিবায়োটিক (নিউমোনিয়া থাকা অবস্থায়):

ক. প্রাপ্তবয়স্ক: অ্যামোক্সিসিলিন ৫০০ এমজি দিনে তিনবার করে পাঁচ দিন; অথবা লিভোফ্লোক্সাসিন ৫০০ এমজি দিনে একবার করে পাঁচ দিন; অথবা সাথে সাথে ৫০০ এমজি অ্যাজিথ্রোমাইসিন তারপর ২৫০ এমজি দিনে একবার করে ৪দিন

খ. শিশু: অ্যামোক্সিসিলিন <১ বৎসর ৩০ এমজি/কেজি; ১-৫ বৎসর ১২৫ এমজি; ৫-১৫ বৎসর ২৫০ এমজি; সব ক্ষেত্রে দিনে তিনবার করে ৫দিন; অথবা অ্যামোক্সিসিলিন ৫০ এমজি/কেজি দিনে দুবার; অথবা অ্যাজিথ্রোমাইসিন ১০ এমজি/কেজি দিনে একবার করে ৫দিন (কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের ডোজের বেশি নয়)।

ডিএম=ডায়াবেটিস মেলিটাস, এইচএফ=হার্ট ফেলিউর, আরএফ=রেনাল ফেলিউর, সিওপিডি=ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ, সিবিসি=কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ইউঅ্যান্ডই=ব্লাড ইউরিয়া এবং ইলেকট্রোলাইটস, স্যাটস=আর্টেরিয়েল অক্সিজেন স্যাচুরেশন, টিএফ=টামিফ্লু (ওসেলটামিভির), সিএপি=কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া

৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে এই ওয়ার্ড চালু করার পর থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত মোট ১৫,৫২০ জন রোগী আইসিডিডিআর,বিতে চিকিৎসার জন্য আসে। এদের মধ্যে ৭৫৫ জনের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণজনিত এবং ১৪,৭৬৫ জনের ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ ছিলো। জ্বর এবং কাশি নিয়ে আগত রোগীদেরকে রেসপিরেটরি ট্রায়াজে রাখা হয় (সারণি ১)। শ্বাসতন্ত্রে সংমণজনিত রোগীদের অন্যান্য লক্ষণগুলো ছিলো শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যাথা, শরীরব্যাথা, ঠাণ্ডায় কাঁপা এবং অবসন্নতা। রেসপিরেটরি ট্রায়াজে আগত সমস্ত রোগীদের মধ্যে ৩৫% শ্বাস গ্রহণে কষ্টের কথা এবং ১২% ডায়রিয়ার কথা জানায়। ট্রায়াজে থাকাকালীন সময়ে ৭৫৫ জনের মধ্যে ২৬৭ জনের (৩৫%) স্কোর ছিলো ≤৬ (কম ইনফ্লুয়েঞ্জা-ঝুঁকিপূর্ণ), ৪৮৮ জনের ≤৭-১৫ (মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ) এবং কারো স্কোরই ≥১৬ (উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ) ছিলো না। মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদেরকে (মেডিয়ান নম্বর ৯) বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে নেওয়া হয় এবং তাদেরকে রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার গড়ে তিনদিন পর শরীরের ওজন অনুযায়ী দিনে দুবার করে অসেলটামিভির দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া, রোগের লক্ষণ এবং বুকের এক্সরে অনুযায়ী শ্বাসতন্ত্রের নিম্নাংশের সংক্রমণ চিকিৎসায় জীবাণুনাশক ওষুধ এবং তার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া হয়। যাদের অসুস্থতা এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ বেশি ছিলো তাদের ৮৭ (১১%) জনকে রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ৮৩ জন সুস্থ হয়ে ওঠে এবং তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, একজন চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে চলে যায়, একজন কোনো কর্মচারীকে না বলেই চলে যায়, এবং বিশেষ সেবাদানকারী ইউনিটে স্থানান্তরিত সেপসিসে আক্রান্ত ১৯ জনের মধ্য থেকে দুজন মারা যায়।

সারণি ১: এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯-এর প্রথম ধাক্কার সময় আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে আগত রোগীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিজেদের জানানো রোগের লক্ষণসমূহ

বৈশিষ্ট্যসমূহ	রেসপিরেটরি ট্রায়াজ থেকে ছেড়ে দেওয়া রোগী (সংখ্যা=৬৬৮)	রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া রোগী (সংখ্যা=৮৭)
পুরুষ রোগী	৬৭%	৭৫%
জ্বর	৯৩%	৯৮%
কাশি	৮৩%	৯৪%
মাথাব্যাথা	৫৫%	৪৭%
শরীরব্যাথা	২৭%	৩৪%
ঠাণ্ডায় কাঁপা	৭%	১১%
অবসন্নতা	২২%	৯%
শ্বাসকষ্ট	৩৩%	৫৫%
ডায়রিয়া	১০%	২১%

রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ১০ জনকে (১১%) ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত দেখা যায়। আক্রান্ত সব রোগীই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং হাসপাতাল থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্য থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা বি-তে আক্রান্ত অন্য তিনজন রোগী সনাক্ত করা হয়। মৃত্যুবরণকারী দুজন শিশুর মধ্যে একজন ছিলো মারাত্মকভাবে অপুষ্টির শিকার এবং ডাউন'স সিনড্রোমে আক্রান্ত। দুজনেরই পানির মতো পাতলা পায়খানা ছিলো এবং সেপসিসে আক্রান্ত ছিলো। পরীক্ষা করে তাদের কারোর মধ্যেই এইচ১এন১

মহামারী ২০০৯ ভাইরাস পাওয়া যায় নি। এই ওয়ার্ডে কর্তব্যরত কোনো স্বাস্থ্যকর্মীই শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত বলে জানান নি এবং তাদের কারোরই এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত কি না তা পরীক্ষার প্রয়োজন হয় নি।

সারণি ২: ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঢাকা হাসপাতালের ট্রায়াজে ভর্তি এবং অ্যাম্বুলেটরি রোগীদের রোগের লক্ষণসমূহের তুলনা

বিষয়সমূহ	ওয়ার্ডে ভর্তি রোগী (সংখ্যা=৮৭)	ট্রায়াজ থেকে ছেড়ে দেওয়া রোগী (সংখ্যা=৬৬৮)	পি-ভ্যালু
জ্বরের স্থায়ীত্ব (দিন)	৩.৪±২.৩	৪.০±৬.১	০.০৪
কাশির স্থায়ীত্ব (দিন)	৩.৮±২.৯	৩.৪±৩.৭	০.৩
শ্বাসকষ্টের স্থায়ীত্ব (দিন)	১.৮±২.৪	১.০±২.১	০.০১
মাথাব্যাথার স্থায়ীত্ব (দিন)	১.৪±২.৬	১.৯±৪.২	০.০৭
শরীরব্যাথার স্থায়ীত্ব (দিন)	০.৯৭±২.০	০.৮৭±১.৯	০.৬
ঠাণ্ডায় কাঁপার স্থায়ীত্ব (দিন)	০.১৩±০.৬	০.৩৫±১.৩	০.০০৭
তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)	৩৭.৮±১.০	৩৭.৫±২.০	০.৩৩
নাড়ির গতি/মিনিট	১১৬±২০	১০৪±২৫	০.০০১
শ্বাস-প্রশ্বাস/মিনিট	৩৮±১৫	২৮±১১	০.০০০
আর্টেরিয়েল অক্সিজেন স্যাচুরেশন (%)	৯৪±১৪	৯৭±৯	০.০৬
ট্রায়াজে রেকর্ডকৃত শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণের স্কোর	৮.১±১.৯	৭.৩±২.৪	০.০০২

সারণি ৩: ২০০৯-সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঢাকা হাসপাতালের ট্রায়াজে পরীক্ষায় নিশ্চিত এইচ১এন১ মহামারীর রোগীদের জনমিতিক, ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি বৈশিষ্ট্যসমূহ (সংখ্যা=১০)

বিষয়সমূহ	মধ্যবর্তী (সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন)
বয়স	১৩ বৎসর (৩ মাস-৬৩ বছর)
লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা)	৪/৬
ভর্তির সময় তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেলসিয়াস)	৩৯ (৩৮-৩৯.৯)
প্রতি মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাস	৩৪ (২৪-৭০)
প্রতি মিনেটে নাড়ির গতি	১৩২ (৮৮-১৭০)
আর্টেরিয়াল অক্সিজেন সেচুরেশন (%)	৯৬ (৮৫-১০০)
হোয়াইট কাউন্ট ($১০^৯$/এল)	৮ (৪-১৫)
হাসপাতালে অবস্থান (দিন)	৪ (১-১৩)

প্রতিবেদক: ঢাকা হাসপাতাল, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)

অর্থানুকূল্য: ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), যুক্তরাজ্য

মন্তব্য

এ-কার্যক্রম থেকে বেশ কিছু অধ্যায় শেখার আছে। প্রথমত এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ সম্পর্কে জনমনে একটি ভীতি এবং এর প্রতি প্রচার মাধ্যমের তীব্র আকর্ষণ থাকার সময় বিনামূল্যে উচ্চ মানসম্মত সেবা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া সত্ত্বেও রেসপিরেটরি ট্রায়াজে আগত রোগীদের পরিমাণ ডায়রিয়া রোগীদের ১০%-এরও কম ছিলো। এটি একটি সময় উপযোগী স্মরণ (রিমাইন্ডার) যে, উন্নয়নশীল দেশে রোগের পিছনের বোঝা (বিশেষ করে সংক্রামক রোগের) অনেক বড় এবং নতুন কোনো মহামারীর সময় তা দুরীভূত হয় না; বরং নতুন মহামারীর রোগীরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ওপর বিদ্যমান থাকা অতিরিক্ত বোঝার ওপর আরো চাপ সৃষ্টি করে। এটি অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, কম উত্তেজনাকর এই সমস্যা নিরসনের জন্য এখনো গবেষণা, অর্থ এবং ইন্টারভেনশন প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, সুযোগ-সুবিধা যেখানে সীমিত সেখানে এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারাত্তক অসুস্থতাসহ উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে থাকা রোগীদের (যাদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন) সম্পর্কে জানার মতো তথ্য অপর্যাপ্ত রয়েছে। তথাপি, আলোচিত ট্রায়াজ এবং চিকিৎসাসেবার দিকনির্দেশনা একটি বাস্তবভিত্তিক উপায় যা এ-ধরনের মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের মতো সীমিত সম্পদের দেশের জন্য সবচেয়ে ভালো একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটি অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা কমিয়ে আনে এবং অসেলটামিভির বা অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য উদ্বিগ্ন রোগী ও মাতাপিতার কাছ থেকে প্রচণ্ড চাপে থাকা চিকিৎসককে সঠিক চিকিৎসা প্রদানে সাহায্য করে। এই ট্রায়াজের মাধ্যমে সনাক্তকৃত ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত সব রোগীই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। এছাড়া, ট্রায়াজে কর্তব্যরত কোনো কর্মচারীই এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয় নি। ২০১০ সালের এপ্রিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুমের প্রারম্ভে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো অনেক বেশি মানুষ এইচ১এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। উল্লিখিত চিকিৎসাসেবা, ট্রায়াজ এবং রোগনির্ণয় ব্যবস্থা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছড়িয়ে দিয়ে স্থানীয়ভাবে খাপ খাওয়াতে পারলে এ-ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় দেশের দক্ষতা ও সামর্থ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্থানীয়ভাবে খাপ খাওয়ানো ট্রায়াজ পদ্ধতি কম সুবিধাসম্বলিত স্থাপনায় রোগীদের চিকিৎসাসেবা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সাহায্য করতে পারে। আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে প্রতিষ্ঠিত নতুন রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত যে ট্রায়াজ এবং রোগী-ব্যবস্থাপনা রয়েছে, ঠিক সেইরকম ব্যবস্থা অথবা কিছু পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে তা বাংলাদেশের অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী স্থাপনায় চালু করা যেতে পারে। অন্যান্য স্বল্প-আয়ের দেশসমূহেও এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ মোকাবেলা করার জন্য এই চিকিৎসা-ইউনিট একটি দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে। মহামারীটি যেহেতু আরো বিস্তৃত হচ্ছে, সেহেতু আইসিডিডিআর,বির ঢাকা হাসপাতালে গঠিত রেসপিরেটরি ট্রায়াজে রোগী সনাক্ত করে তাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী রেসপিরেটরি এবং ডায়রিয়া ওয়ার্ডে চিকিৎসা প্রদান অব্যাহত থাকবে। এইচ১এন১ মহামারী ২০০৯ ভাইরাসে আক্রান্ত আগত সব রোগীকে এই হাসপাতাল সার্থকভাবে এবং সঠিক উপায়ে চিকিৎসা প্রদান করতে সক্ষম এবং এ-ব্যাপারে তাদের ওপর আস্থা রাখা যায়।

References

1. Dawood FS, Jain S, Finelli L, Shaw MW, Lindstrom S, Garten RJ *et al*. Emergence of a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans. *N Engl J Med* 2009;360:2605-15.
2. Garten RJ, Davis CT, Russell CA, Shu B, Lindstrom S, Balish A *et al*. Antigenic and genetic characteristics of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza viruses circulating in humans. *Science* 2009;325:197-201. Epub 2009 May 22.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Outbreak of swine-origin influenza A (H1N1) virus infection - Mexico, March-April 2009. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2009;58:467-70.
4. China confirms first mainland case of swine flu. (AFP) – May 10, 2009. (http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5il6e1zrySynYClgrG9tGXduxgFew, accessed on 12 Nov 2009).
5. Perez-Padilla R, de la Rosa-Zamboni D, Ponce de Leon S, Hernandez M, Quiñones-Falconi F, Bautista E *et al*. Pneumonia and respiratory failure from swine-origin influenza A (H1N1) in Mexico. *N Engl J Med* 2009;361:680-9. Epub 2009 Jun 29.
6. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. *Crit Care Med* 1985;13:818-29.
7. World Health Organization. CDC Protocol of realtime RTPCR for Influenza A (H1N1). Geneva: World Health Organization 2009. (http://www.euro.who.int/Document/INF/CDC_realtime_RTPCR_H1N1.pdf, accessed on 10-09-09).
8. World Health Organization. Clinical management of human infection with pandemic (H1N1) 2009: revised guidance. World Health Organization: Global alert and response. Nov 2009. (http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical_management/en/index.html, accessed on 15-12-2009).
9. British Thoracic Society Standards of Care Committee. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults. *Thorax* 2001;56 Suppl 4:IV1-64.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদশীলতার অনুপাত: ডিসেম্বর ২০০৮-নভেম্বর ২০০৯

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৮৫)	*ভি. কলেরি ও১* (সংখ্যা=৫৯৯)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৯.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৫১.৮	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৮.২	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৭.৬	০.৩
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৭৮.৮	৯৯.৫
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১৭.৯
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: ডিসেম্বর ২০০৮-নভেম্বর ২০০৯

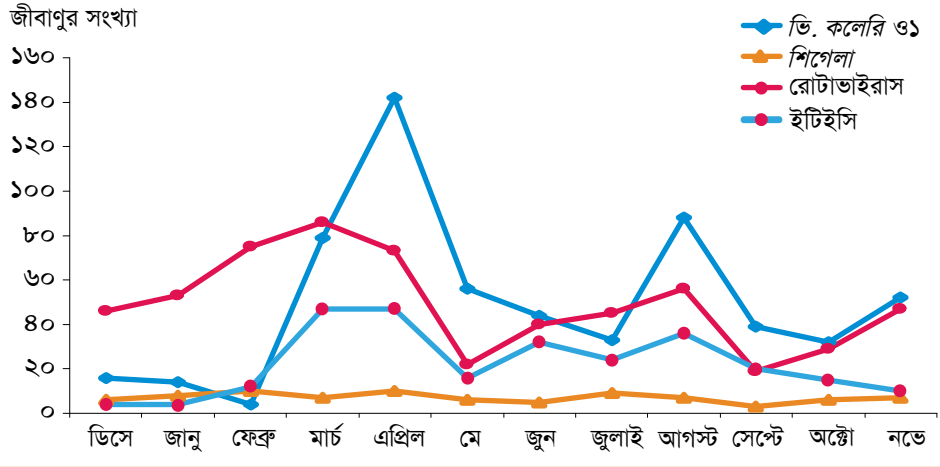

ওষুধের বিরুদ্ধে ৩২ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: জুলাই ২০০৮-জুন ২০০৯

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট সংখ্যা=৩২ (%)
	প্রাথমিক সংখ্যা=৩১ (%)	একোয়ার্ড* সংখ্যা=১ (%)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	৮ (২৫.৮)	০ (০.০)	৮ (২৫.০)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	২ (৬.৫)	০ (০.০)	২ (৬.৩)
ইথামবিউটাল	১ (৩.২)	০ (০.০)	১ (৩.১)
রিফামপিসিন	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
অন্যান্য ওষুধ	৮ (২৫.৮)	০ (০.০)	৮ (২৫.০)

( ) শতকরা হার *একমাস বার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১	০ (০.০)	০ (০.০)	১ (১০০.০)
ক্লোরামফেনিকল	০	০ (০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিআক্সোন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	১	০ (০.০)	০ (০.০)	১ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	১	১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৪৯	৩০ (৬১.০)	০ (০.০)	১৯ (৩৯.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৪৯	২৮ (৫৭.০)	০ (০.০)	২১ (৪৩.০)
ক্লোরামফেনিকল	৪৯	২৯ (৫৯.০)	০ (০.০)	২০ (৪১.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৪৯	৪৯ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪৯	১ (২.০)	১ (২.০)	৪৭ (৯৬.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪৯	১ (২.০)	০ (০.০)	৪৮ (৯৮.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি-র কমালপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: মে ২০০৭-নভেম্বর ২০০৯

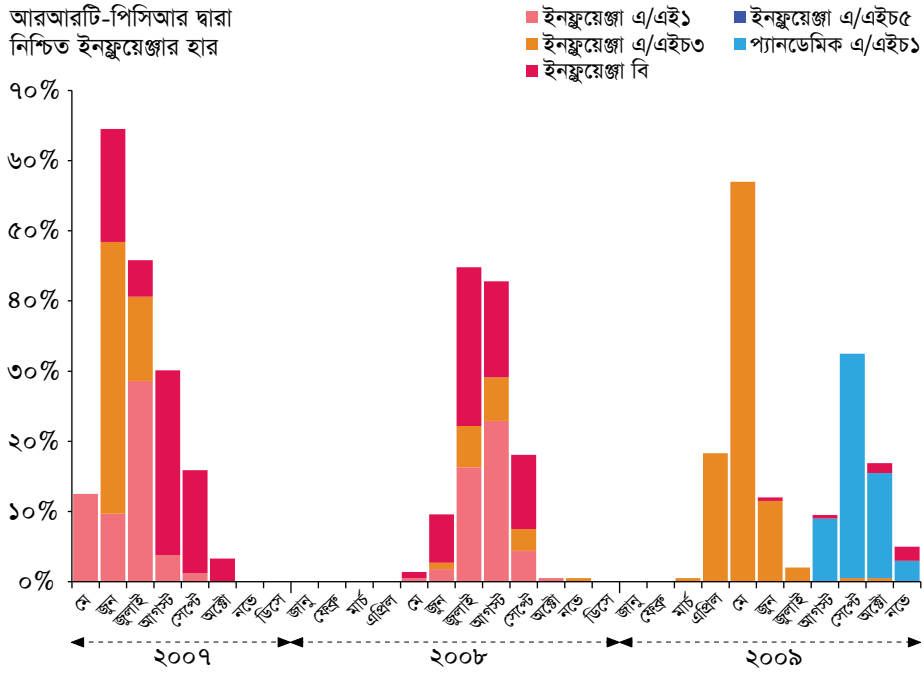

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় সনাক্তকৃত কিউটেনাস অ্যানথ্রাক্স

আইসিডিডিআ,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), রাজকীয় নেদারল্যান্ডস-এর দূতাবাস (ইকেএন), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং সুইডিস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ (সিডা)। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ডরথি সাউদার্ন
এডোয়ার্ডো আজিজ বামগার্টনার

অতিথি সম্পাদক:
জোয়ানা ব্রেলিনস্কা

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
১ম নিবন্ধ: জাহাঙ্গীর হোসেন
২য় নিবন্ধ: কামরুন নাহার
৩য় নিবন্ধ: আলী মিরাজ খান

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে:
ডাইনামিক প্রিন্টার্স